মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

কথামুখ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মহাত্মা গান্ধি। শ্রী চৈতন্যের পর এদেশে তিনিই প্রথম গণ আন্দোলনের সূচনা করে দেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেন। একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তিনি যে অভিনব ধারার প্রবর্তন করেন তা শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গান্ধিজি তাঁর জীবনচর্যা ও আন্দোলন পরিচালনার ধারাকে সমখাতে প্রবাহিত করে জাতির প্রাণপ্রবাহে এনেছিলেন গতি। তাঁর সমস্ত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত ছিল সত্যের ওপর। তাঁর ধারণায়— সত্যই ঈশ্বর। কিন্তু মানুষের কাছে বিষয়টি প্রাঞ্জল না হওয়ার ফলে এটি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই আজও। গান্ধিজি বা তাঁর পথের সঙ্গে একমত না হলেও তাঁকে অস্বীকার করতে পারছেন না কেউই— আজও। এখানেই তাঁর অনন্যতা। বর্ণময় সেই চরিত্রকেই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে— সবার মতো করে। যদি তা ভালো লাগে, অবশ্যই তা গান্ধি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্য। ত্রুটি যদি কিছু থাকে তা লেখকের।

বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় 'গ্রন্থতীর্থ' সংস্থার কর্ণধার শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ককে। তিনি বিশ্বের স্মরণীয় চরিত্রগুলি প্রকাশের যে প্রকল্প নিয়েছেন সেই অনুসারেই প্রকাশিত হল এটি। বইটি রচনার ক্ষেত্রে গান্ধি রচনাবলি, লুই ফিশারের 'দি লাইফ অব মহাত্মা গান্ধি', নির্মল কুমার বসুর 'গান্ধী চরিত', অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যর 'গান্ধিজির জীবন প্রভাত' অণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বহুরূপী গান্ধিজি', অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'টলস্টয়-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ' এবং আরও বেশ কিছু বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই স্কটিশ চার্চ কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রী অমলেশ রায়কেও।

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

গান্ধিজীবনের প্রেক্ষাপট	১১
গান্ধিজির বাবা-মা	১৭
ছেলেবেলার দিনগুলি	২৪
গান্ধিজির ছাত্রজীবন	২৭
বদ-সঙ্গ : আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছিলেন	৩৩
ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে	৪২
মুম্বাইয়ে ব্যারিস্টারি	৫০
দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজি	৬০
নেতৃত্বে গান্ধিজি	৬৪
শুরু হল আন্দোলন	৭৩
আক্রান্ত গান্ধিজি	৮২
বুয়র যুদ্ধ ও গান্ধিজি	৮৮
দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন আন্দোলনে	৯৪
এবার কেন্দ্র ভারত	১০১
চম্পারণ সত্যাগ্রহ	১০৭
আইন অমান্য আন্দোলন ও স্বাধীনতা	১১৫

গান্ধিবাদ	১১৯
গান্ধিজির শিক্ষানীতি	১২২
বহুরূপী গান্ধিজি : জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ	১২৬
তলস্টয় ও গান্ধিজি	১৩৩
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজি	১৩৮
রোঁমা রঁল্যা ও গান্ধিজি	১৪৩
সুভাষচন্দ্র ও গান্ধিজি	১৪৬
গান্ধিজি ও তাঁর পরিবার	১৪৯
জীবনপঞ্জি	১৫৩

গান্ধিজীবনের প্রেক্ষাপট

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি। সোনাঝরা সেই সময়। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বহু জায়গাতেই নতুন হাওয়া। ভারতে তো সে হাওয়া তখন বইছে কিছুটা প্রবল বেগেই। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে স্পষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে সেই ঝোড়ো হাওয়াকে। একদিকে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে তারই মধ্যে নতুনের সৃষ্টি-যন্ত্রণা।

স্মরণীয় সেই সময়। ১৮৫৭ -এর 'মহাবিপ্লব' সিপাহি বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। রাত পোয়াতে যে বণিকের মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল রাজদণ্ড, তারও হয়েছে হাত বদল। বণিক ইংরেজ নয়, ভারত চলে এসেছে সরাসরি ব্রিটেনের মহারানির অধীনে। সেই হাত বদলে ভারতের কপালফের হয়নি কিছুই। বরং শোষণ পেয়েছে নতুন মাত্রা। সামাজিক জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত। সাবেক সমাজব্যবস্থা ভেঙে গড়ে উঠছে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সেই শ্রেণির চাহিদা অন্যরকম। স্বপ্নও অন্যরকম। সে শ্রেণি একদিকে চাইছে রাজানুগ্রহ, আবার সেই শ্রেণির বুকেই জ্বলছে আগুন। অনুভব করতে পারছে পরাধীনতার গ্লানি। ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই শিক্ষিত হয়ে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেছে সেই শ্রেণি।

প্রভু ইংরেজদের প্রথমটায় সে দিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বরং ইউরোপের বুকে প্রধান শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরে তারা আত্মস্ফীত। শুধু ইউরোপ নয়, সারা বিশ্বের মুখ্য শক্তিতে পরিণত হবার তান্ত্রিক-সাধনায় তারা তখন মত্ত। সেই সাধনার ফাঁকফোকরগুলি তখনও বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি তাদের কাছে।

তবে ইউরোপের সবাই যে একই ছন্দে চলছে তা নয়। সেখানকারও বহু মানুষ আগুনের আঁচ অনুভব করতে শুরু করেছেন। বুঝতে শিখেছেন ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে করছে মনুষত্বের অবমাননা। মানুষের এই অপমান তাঁদের বিচলিত করছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন, এই অপমান করার চাকাটা একদিন উলটো মুখে ঘুরবে। তখন সেই চক্রে নিষ্পেষিত হতে হবে নিজেদেরই। বুঝছেন, মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে না পারলে একদিন নিজেদেরই বন্দি হয়ে যেতে হবে। সেদিন প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে মূল্য দিতে হবে তা অনুমান করে শিউরে উঠতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের চিন্তনে আগামীর যে ছবি মূর্ত হতে থাকে তাতে তাঁরা একইসঙ্গে আতঙ্কিত, আবার আশাবাদীও। নিজেদের শিকড়ে টান পড়ার দুর্ভাবনা তাঁদের বিচলিত করে। তবে মানুষের মুক্তির আনন্দের মধ্যেই তাঁরা তখন খুঁজে পেতে থাকেন আনন্দ। সেই আনন্দের প্রকাশ ঘটতে থাকে তাঁদের কথায়। তাঁদের রচনায়। তাঁরা হয়ে উঠতে থাকেন ব্যতিক্রমী। বলা যেতে পারে, তাঁরা হয়ে ওঠেন বিবেক—নিজেদের, বিশ্বেরও।

এমনই এক বিশ্ব-বিবেক জন রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০খ্রিস্টাব্দে)। নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তার দীপ্তিতে আশ্চর্য উজ্জ্বল তিনি। মানুষের মুক্তি-প্রয়াসী রাস্কিন অনাগত এক সুন্দর পৃথিবীর অধিবাসী। তাঁর রচনার মধ্যদিয়ে বণিকবৃত্তি, বস্তুবাদ, যন্ত্রবাদ এবং ধনতন্ত্রকে তিরস্কারে বিদ্ধ করছেন তখন তিনি। ইংল্যান্ডে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পদধ্বনি যেন শোনা যায় তার রচনার মধ্যে। বস্তুত ইংল্যান্ডে সমাজবাদ প্রবক্তাদের অগ্রপথিক রাস্কিন। তাঁর সেই নবীন অথচ এক

ধরনের বিপ্লবী চেতনায় জীবন্ত সেইসব গ্রন্থ শুধু ইউরোপ নয়, ভারতের চিন্তাজগতেও তুলছে জিজ্ঞাসার ঝড়। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে সৃষ্টি করছে এক ধরনের জাতীয়তাবোধ। সেই বোধই একদিন সংগঠিত পথে এগিয়ে চলে আন্দোলনের পথে। উদ্যত হয় ইংরেজকেও আঘাত হানতে।

ব্রিটেনের মতোই রাশিয়াতেও এসে গেছেন তখন আর এক ঋষিকল্প লেখক— লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০ খ্রিস্টাব্দে)। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার, নতুন দিনের মানুষের কথা তুলে ধরছেন তিনি সবার সামনে। শোনাচ্ছেন তিনি বিশ্বমানবিকতার বাণী।

একইভাবে জার্মানিতে আবির্ভূত হয়েছেন শুধু ওই শতক নয়, সবসময়েরই দর্শন চিন্তার অন্যতম অগ্রপথিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে)। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায়, শোষিত, উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অবিরাম শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ, সর্বহারাদের এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার তাত্ত্বিক দর্শন রচনার মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের চোখেই তিনি এনেছেন এক নতুন স্বপ্ন।

ইউরোপ জুড়ে এই যে নতুন চিন্তা, নতুন বৌদ্ধিক জগৎ গড়ার প্রয়াস তার প্রকাশ ঘটতে থাকল ভারতেও। প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের জীবন বাঁক নিতে উন্মুখ হল নতুন দিকে। নতুন চেতনা, নতুন ভাবনা ভারতের বৌদ্ধিক জগতেও তুলল আলোড়ন। প্রায় একই সময় সারা ভারত জুড়েই এমন সব ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটতে থাকল যাতে বিস্ময়ে শ্রদ্ধাবনত হতে হয়। বাংলার বুকে এই একটি শতকেই যখন রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ), বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রিস্টাব্দ), অরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতির মতো স্মরণীয় পুরুষদের আবির্ভাব, সেই সময়ই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আবির্ভূত হচ্ছেন নতুন যুগের চিন্তানায়করা।

তামিলনাড়ুতে সুব্রহ্মণ্যম ভারতী (১৮৮২-১৯২১ খ্রিঃ), মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০ খ্রিস্টাব্দ) গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫), ফিরোজ শাহ মেহতা (১৮৪৫-১৯১৫), দাদাভাই নৌরজি (১৮২৫-১৯১৭), পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮), উত্তরপ্রদেশে মদনমোহন মালব্য (১৮৬০-১৯৪৬), মোতিলাল নেহরু (১৮৬১-১৯৩১) প্রভৃতির সঙ্গে শতকের আরেক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিরও আবির্ভাব হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে গণ আন্দোলন এবং অহিংস সংগ্রামকে অস্ত্র করে তিনি স্থাপন করেন এক নতুন নজির। বস্তুত গান্ধিজির রাজনৈতিক চিন্তাধারা শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বেই এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের আট বছর পরে এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ১৬ বছর আগে গান্ধিজির আবির্ভাব। তাঁর তারুণ্যের সূচনায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলেও ভারত জুড়ে তখনই তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা বলা যায় না কোনো মতেই। তার অন্যতম কারণ, কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল অনেকটাই পাশ্চাত্যের ক্লাব -এর আদর্শে। সেখানে সমাজের উচ্চশ্রেণির কিছু মানুষজন উপস্থিত হতেন। মূলত ইংরেজি ভাষাতেই তাঁরা দেশের সমস্যা নিয়ে বেশ গুরুগম্ভীর আলোচনা করতেন এবং শেষে ওই ব্রিটিশ সরকারকেই কার্যত ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা শেষ করতেন। যে-সব সমস্যা তাঁদের শ্রেণিকে বিব্রত করত তা নিয়েই হত তাঁদের কথাবার্তা। সেসব সমস্যার সঙ্গে কার্যত দেশের সাধারণ মানুষের কোনো রকম যোগ থাকত না। ফলে সাধারণ মানুষের সে সম্পর্কে আগ্রহ প্রায় ছিলই না। সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশই প্রায় ছিল না রাজনৈতিক নেতাদের। ফলে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ছিল না।

এইরকম একটা অবস্থার মধ্য থেকে উঠে এসেও, গান্ধিজি কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার কথা ভেবেই।

গান্ধিজির পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্যের চিন্তানায়কদের প্রভাবই গান্ধিজিকে নতুন পথে এগোতে সাহায্য করে। 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের 'মহাত্মা' গান্ধি তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেন ভারতে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায়। তারপর ঘটনাক্রমেই জড়িয়ে পড়েন তিনি সেখানকার রাজনীতির সঙ্গে। বলা যায়, পরিস্থিতিই তাঁকে সেদিন বাধ্য করেছিল রাজনীতিতে নামতে। আবার সেই রাজনীতির পথ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন পাশ্চাত্যেরই চিন্তানায়ক জন রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থে। সেইসঙ্গে তাঁর বৌদ্ধিক জগৎকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিলেন কাউন্ট লিও তলস্তয়। বস্তুত তলস্তয়ের আদর্শেই সম্পূর্ণ নতুন পথে শুরু করেছিলেন তিনি তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই সময় 'কালা আদমি'-দের ওপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা যে নির্মম অত্যাচার করত তার শিকার হন গান্ধিজি স্বয়ং-ও। পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েই তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গড়ে তুললেন এক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন। সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ঘটল তাঁর এক মহত্তর জীবনের উত্তরণ। তাঁর সেই আন্দোলন—তাঁর জীবনের রূপান্তরের পর্বে যাওয়ার আগে আমাদের আরও ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করা দরকার গান্ধি জীবনে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ বিশেষ করে রাস্কিন এবং তলস্তয় কীভাবে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার ওপর।

গান্ধিজি নিজে বারবার স্বীকার করেছেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনাদর্শ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাস্কিনের 'আনটু দি লাস্ট' বইটির ভূমিকা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্কিনের সঙ্গে গান্ধিজির তেমন কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেনি। সেদিক থেকে তলস্তয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূত্রেই গান্ধি জীবনে তলস্তয়ের প্রভাব হয় আরও গভীর এবং সর্বব্যাপীও। অবশ্য তলস্তয়ের সঙ্গেও গান্ধিজির পরিচয় তাঁর একটি বই দিয়েই। তলস্তয়ের 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ' গান্ধিজিকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। বস্তুত এই বইটি শুধু তাঁর রাজনৈতিক নয়, সামগ্রিক জীবনবোধকেও পূর্ণতা পেতে সাহায্য করেছিল সবচেয়ে বেশি।